চর্যাপদ

চর্যাপদ বাংলা ভাষার প্রাচীনতম পদ সংকলন তথা সাহিত্য নিদর্শন। নব্য ভারতীয় আর্যভাষারও প্রাচীনতর রচনা এটি। খ্রিষ্টীয় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে রচিত এই গীতিপদাবলির রচয়িতারা ছিলেন সহজিয়া বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ। বৌদ্ধ ধর্মের গূঢ় অর্থ সাংকেতিক রূপের আশ্রয়ে ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যেই তাঁরা পদগুলো রচনা করেছিলেন। বাংলা সাধন সংগীত শাখাটির সূত্রপাতও হয়েছিলো এই চর্যাপদ থেকেই। সে বিবেচনায় এটি একটি ধর্মগ্রন্থজাতীয় রচনা। একই সঙ্গে সমকালীন বাংলার সামাজিক ও প্রাকৃতিক চিত্রাবলি এই পদগুলোতে উজ্জ্বল। এর সাহিত্যগুণ এখনও চিত্তাকর্ষক। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থশালা থেকে চর্যার একটি খণ্ডিত পুঁথি উদ্ধার করেন। পরবর্তীতে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে চর্যাপদের সঙ্গে বাংলা ভাষার অনস্বীকার্য যোগসূত্র বৈজ্ঞানিক যুক্তিসহ প্রতিষ্ঠিত করেন। চর্যাপদের প্রধান কবিগণ হলেন লুইপাদ, কাহ্নপাদ, ভুসুকুপাদ, শবরপাদ প্রমুখ।

আবিষ্কার

বাংলায় মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবার আগে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুসমাজের পীড়নের আশঙ্কায় বাংলার বৌদ্ধগণ তাঁদের ধর্মীয় পুঁথিপত্র নিয়ে শিষ্যদের সঙ্গী করে নেপাল, ভুটান ও তিব্বতে পলায়ন করেছিলেন– এই ধারণার বশবর্তী হয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তিনবার নেপাল পরিভ্রমণ করেন। ১৮৯৭ সালে বৌদ্ধ লোকাচার সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনি প্রথমবার নেপাল ভ্রমণ করেন। ১৮৯৮ সালের তার দ্বিতীয়বার নেপাল ভ্রমণের সময় তিনি কিছু বৌদ্ধ ধর্মীয় পুঁথিপত্র সংগ্রহ করেন। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয়বার নেপাল ভ্রমণকালে চর্যাচর্যবিনিশ্চয় নামক একটি পুঁথি নেপাল রাজদরবারের অভিলিপিশালায় আবিষ্কার করেন। চর্যাচর্যবিনিশ্চয়, সরহপাদের দোহা এবং অদ্বয় বজ্রের সংস্কৃত সহজাম্নায় পঞ্জিকা, কৃষ্ণাচার্য বা কাহ্নপাদের দোহা, আচার্যপাদের সংস্কৃত মেখলা নামক টীকা ও আগেই আবিষ্কৃত ডাকার্ণব পুঁথি একত্রে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে (শ্রাবণ, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা বৌদ্ধগান ও দোঁহা শিরোনামে সম্পাদকীয় ভূমিকাসহ প্রকাশ করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মোট ৪৬টি পূর্ণাঙ্গ ও একটি খণ্ডিত পদ পেয়েছিলেন। পুঁথিটির মধ্যে কয়েকটি পাতা ছেঁড়া ছিল। প্রবোধচন্দ্র বাগচী চর্যার যে তিব্বতি অনুবাদ সংগ্রহ করেন তাতে আরও চারটি পদের অনুবাদসহ ওই খণ্ডপদটির অনুবাদও পাওয়া যায়। মূল পুঁথির পদের সংখ্যা ছিল ৫১। মূল তিব্বতি অনুবাদের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, মূল পুঁথির নাম চর্যাগীতিকোষ এবং এতে ১০০টি পদ ছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত পুঁথিটি চর্যাগীতিকোষ থেকে নির্বাচিত পুঁথিসমূহের সমূল টীকাভাষ্য।

নামকরণ

আবিষ্কৃত পুঁথিতে চর্যা-পদাবলির যে নাম পাওয়া যায় সেটি হল 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থে এই নামটিই ব্যবহার করেছেন, সংক্ষেপে এটি ‘বৌদ্ধগান ও দোহা’ বা ‘চর্যাপদ’ নামেও অভিহিত হয়ে থাকে। কিন্তু আবিষ্কৃত পুঁথিটি যেহেতু মূল পুঁথি নয়, মূল পুঁথির নকলমাত্র এবং মূল পুঁথিটি (তিব্বতি পুঁথি) যেহেতু এপর্যন্ত অনাবিষ্কৃত, সেই কারণে পরবর্তীকালে চর্যা-পদাবলির প্রকৃত নাম নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে চর্যার প্রথম পদের সংস্কৃত টীকাটি (শ্রীলূয়ীচরণাদিসিদ্ধরচিতেঽপ্যাশ্চর্যচর্যাচয়ে। সদ্বর্ত্মাবগমায় নির্ম্মল গিরাং টীকাং বিধাস্যে স্ফুটনম।।) উদ্ধৃত করে শ্লোকাংশের 'আশ্চর্যচর্যাচয়' কথাটিকে গ্রন্থনাম হিসাবে গ্রহণ করার প্রস্তাব রাখেন। তাঁর মতে, 'আশ্চর্যচর্যাচয়' কথাটিই নেপালী পুঁথি নকলকারীর ভুলবশত 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' হয়েছে। তবে এই মতের যথার্থতা বিষয়ে আচার্য অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সন্দেহ প্রকাশ করেন। প্রবোধচন্দ্র বাগচী ওই একই সূত্র ধরে চর্যা-পুঁথির নাম 'চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়' রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু আচার্য অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই মত খণ্ডন করে লিখেছেন, "'আশ্চর্যচর্যাচয়' নামটিও অযুক্তিযুক্ত নয়। কিন্তু 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' ও 'আশ্চর্যচর্যাচয়', দুই নামকে মিলিয়ে 'চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়' নামটি গ্রহণ করা যায় না। কারণ এই 'জোড়কলম' শব্দটি আধুনিক পণ্ডিতজনের পরিকল্পিত।”

আধুনিক গবেষকগণ তেঙ্গুর গ্রন্থমালা (Bastan-hgyar) থেকে অনুমান করেন মূল পুঁথিটির নাম ছিল চর্যাগীতিকোষ এবং তার সংস্কৃত টীকাটি 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' — অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই মত গ্রহণ করেছেন।

রচনাকাল

চর্যার রচনার সময়কাল নিয়েও ইতিহাস গবেষকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মতে চর্যার পদগুলি খ্রিস্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে রচিত। কিন্তু ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও রাহুল সাংকৃত্যায়ন এই সময়কালকে আরও ২০০ বছর পিছিয়ে দিয়ে চর্যার রচনাকাল খ্রিস্টীয় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী বলে মতপ্রকাশ করেছেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান (৯৮০ – ১০৫৩ খ্রিস্টাব্দ) তিব্বত যাত্রার পূর্বে (১০৩০ খ্রিস্টাব্দ) লুইপাদের অভিসময়বিহঙ্গ রচনায় সাহায্য করেছিলেন। একথা সত্য হলে লুইপাদ দশম শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান থাকবেন। অপরদিকে তিব্বতি কিংবদন্তী অনুসারে তিনিই সিদ্ধাচার্যদের আদিগুরু; অর্থাৎ, চর্যার সময়কালও দশম শতাব্দীর পূর্বে হতে পারে না।

অন্যদিকে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে হেবজ্রপঞ্জিকাযোগরত্নমালা নামে এক বৌদ্ধতান্ত্রিক পুঁথির সন্ধান মেলে, যেটির রচনাকাল শেষ পালরাজা গোবিন্দপালের (১১৫৫ খ্রিস্টাব্দ) শাসনকাল। বিশেষজ্ঞদের মতে এই পুঁথির রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণাচার্যই প্রকৃতপক্ষে চর্যার কাহ্নপাদ বা চর্যা-টীকার কৃষ্ণাচার্য। নাথ সাহিত্য অনুযায়ী কাহ্নপাদের গুরু জালন্ধরিপাদ বা হাড়িপা, যিনি গোরক্ষনাথের শিষ্য ছিলেন। আবার মারাঠি গ্রন্থ জ্ঞানেশ্বরী (রচনাকাল আনুমানিক ১২৯০ খ্রিস্টাব্দ) থেকে জানা যায় উক্ত গ্রন্থের রচয়িতা জ্ঞানদেব দীক্ষালাভ করেন নিবৃত্তিনাথের কাছ থেকে, যিনি গোরক্ষনাথের শিষ্য গেইনীনাথ বা গোয়নীনাথের থেকে দীক্ষাপ্রাপ্ত। সেই হিসাবেও কাহ্নপাদকে দ্বাদশ শতাব্দীর মানুষ বলে মনে হয়।

এইসব তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে চর্যার পদগুলি খ্রিস্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে রচিত বলেই অনুমিত হয়। তবে তার পরেও দু-তিনশো বছর ধরে গোপনে চর্যাগীতি রচিত হয়েছিল। শশিভূষণ দাশগুপ্ত নেপাল ও তরাই অঞ্চল থেকে এই ধরনের শতাধিক পদ উদ্ধার করেছেন ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে। এগুলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় নব চর্যাপদ নামে সংকলিত ও প্রকাশিত হয়।

কবি

চর্যাপদের কবি বা সিদ্ধাচার্য চর্যাপদ রচনা করেছিলেন। সাধারণত বজ্রযানী ও সহজযানী আচার্যগণই সিদ্ধাচার্য নামে অভিহিত হতেন। তিব্বতি ও ভারতীয় কিংবদন্তিতে এঁরাই 'চৌরাশি সিদ্ধা' নামে পরিচিত। তবে এই ৮৪ জন সিদ্ধাচার্য আসলে কারা ছিলেন তা সঠিক জানা যায় না।

চর্যার কবিরা ছিলেন পূর্ব ভারত ও নেপাল রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসী। কেউ পূর্ববঙ্গ, কেউ উত্তরবঙ্গ, কেউ বা রাঢ়ের অধিবাসী ছিলেন। কেউ কেউ বিহার, কেউ ওড়িশা, কেউ বা আবার অসম বা কামরূপের বাসিন্দাও ছিলেন। এঁরা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ক্ষত্রিয়, বণিক এমনকি অন্ত্যজ শ্রেণী থেকেও এসেছিলেন। কেউ কেউ রাজবংশজাতও ছিলেন। এঁরা পূর্বাশ্রমের পিতৃপ্রদত্ত নাম ত্যাগ করেছিলেন বলে নাম দেখে এঁদের জাতি স্থির করা যায় না। এঁরা হিন্দুধর্মের সনাতন শাস্ত্রবিধান মানতেন না বলে এঁদের বেদবিরোধী ও নাস্তিক আখ্যা দেওয়া হয়। সাধনার নামে গোপনে কেউ কেউ যৌনাচারও করতেন বলে আধুনিক গবেষকগণ মত প্রকাশ করেন।

আবিষ্কৃত পুঁথিটিতে ৫০টি চর্যায় মোট ২৪ জন সিদ্ধাচার্যের নাম পাওয়া যায়। এঁরা হলেন: লুই, কুক্কুরী, বিরুআ, গুণ্ডরী, চাটিল, ভুসুকু, কাহ্ন, কাম্বলাম্বর, ডোম্বী, শান্তি, মহিত্তা, বীণা, সরহ, শবর, আজদেব, ঢেণ্ঢণ, দারিক, ভাদে, তাড়ক, কঙ্কণ, জঅনন্দি, ধাম, তান্তী পা, লাড়ীডোম্বী। এঁদের মধ্যে লাড়ীডোম্বীর পদটি পাওয়া যায়নি। ২৪, ২৫ ও ৪৮ সংখ্যক পদগুলি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত পুঁথিতে না থাকলেও ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী আবিষ্কৃত তিব্বতি অনুবাদে এগুলির রচয়িতার নাম উল্লিখিত হয়েছে যথাক্রমে কাহ্ন, তান্তী পা ও কুক্কুরী। এই নামগুলির অধিকাংশই তাদের ছদ্মনাম এবং ভনিতার শেষে তারা নামের সঙ্গে 'পা' (<পদ) শব্দটি সম্ভ্রমবাচক অর্থে ব্যবহার করতেন।

সাধারণভাবে লুইপাদকেই আদি সিদ্ধাচার্য মনে করা হয়। তাঞ্জর বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ছিলেন বাঙালি। তিনি মগধের বাসিন্দা ছিলেন ও রাঢ় ও ময়ূরভঞ্জে আজও তার নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হয়। চর্যার টীকায় তার অন্য নাম লূয়ীপাদ বা লূয়ীচরণ। ১ ও ২৯ সংখ্যক পদদুটি তার রচিত।

চর্যার পুঁথিতে সর্বাধিক সংখ্যক পদের রচয়িতা কাহ্ন বা কাহ্নপাদ। তিনি কৃষ্ণাচার্য, কৃষ্ণপাদ ও কৃষ্ণবজ্র নামেও পরিচিত।

পুঁথিতে তার মোট ১১টি পদ (পদ- ৭, ৯, ১১, ১২, ১৮, ১৯, ২৪, ৩৬, ৪০, ৪২ ও ৪৫) পাওয়া যায়। ইনি ওড়িশার এক ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন বলে জানা যায়। শৌরসেনী অপভ্রংশ ও মাগধী অপভ্রংশজাত বাংলায় তিনি পদ রচনা করতেন। ভুসুকুপাদ বাঙালি ছিলেন বলে অনেকের অনুমান। কেউ কেউ তাকে চর্যাগানের শান্তিপাদের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন। চর্যার পুঁথিতে তার আটটি পদ (পদ- ৬, ২১, ২৩, ২৭, ৩০, ৪১, ৪৩, ৪৯) আছে। এছাড়া সরহপাদ চারটি (পদ- ২২, ৩২, ৩৮, ৩৯), কুক্কুরীপাদ তিনটি(পদ- ২, ২০, ৪৮) এবং শান্তিপাদ (পদ- ১৫ ও ২৬) ও শবরপাদ দুইটি পদ (পদ- ২৮ ও ৫০) রচনা করেন। একটি করে পদ রচনা করেন বিরুআ (পদ ৩), গুণ্ডরী (পদ ৪), চাটিল (পদ ৫), কম্বলাম্বরপাদ (পদ ৮), ডোম্বীপাদ (পদ ১৪), মহিণ্ডা (পদ ১৬), বীণাপাদ (পদ ১৭), আজদেব (পদ ৩১), ঢেণ্ঢণ (পদ ৩৩), দারিক (পদ ৩৪), ভদ্রপাদ (পদ ৩৫), তাড়ক (পদ ৩৭), কঙ্কণ (পদ ৪৪), জঅনন্দি (পদ ৪৬), ধাম (পদ ৪৭) ও তান্তী পা (পদ ২৫, মূল বিলুপ্ত)। নাড়ীডোম্বীপাদের পদটি পাওয়া যায় না।

ভাষা

চর্যাপদ আবিষ্কৃত হওয়ার পর এর বিষয়, ভাষা ও কাল সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা হয়। এতে তেইশজন পদকর্তার ৪৭টি পদ আছে। চর্যার কবিদের কাল খ্রিস্টীয় নবম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে ধরা হয়। অবশ্য মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মতে চর্যার কোনো কোনো পদকর্তার আবির্ভাবকাল সপ্তম অথবা অষ্টম শতক। চর্যাকাররা সহজযান ধর্মমতে দীক্ষিত ও সিদ্ধাচার্য নামে পরিচিত ছিলেন। তান্ত্রিক যোগসাধনা তাঁদের ধর্মমতের বৈশিষ্ট্য। চর্যাপদে এ সাধনার কথা হেঁয়ালিপূর্ণ ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। ফলে দেশজ ভাষায় রচিত হলেও চর্যাপদের মূল ভাবের মর্মোদ্ঘাটন দুরূহ ব্যাপার। এ কারণে পন্ডিতগণ এ ভাষাকে ‘আলো-আঁধারি’ বা সন্ধ্যা ভাষা নামে অভিহিত করেন।

চর্যাপদের ভাষা অবিমিশ্র বাংলা নয়, কারণ চর্যার কবিগণ ছিলেন বিভিন্ন অঞ্চলের (যথা বাংলা, উড়িষ্যা, আসাম, বিহার)। বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমা তখন নানাদিকে প্রসারিত ছিল। সেজন্য উড়িষ্যা, আসাম এমনকি বিহারের ভাষাদর্শও চর্যাপদে লক্ষ্য করা যায়। ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায় বাংলা, অসমিয়া ও উড়িয়া ভাষা পূর্ব ভারতের একই মূল কথ্য ভাষা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তাই বাঙালি, অসমিয়া ও উড়িষ্যাবাসী প্রত্যেকেই চর্যাপদের দাবিদার। তবে ‘বঙ্গাল দেশ’, ‘পঁউয়া খাল’ (পদ্মানদী), ‘বঙ্গালী ভইলি’ ইত্যাদির উল্লেখ থাকায় বাঙালির দাবি অগ্রগণ্যরূপে বিবেচিত হয়।

ধর্মমত

সিদ্ধাচার্যগণ অসামান্য কবিত্বশক্তির অধিকারী হলেও তাঁরা মূলত ছিলেন সাধক। বৌদ্ধ সহজযানী চিন্তা, দর্শন ও সাধনপদ্ধতিই তাই চর্যাপদের উপজীব্য হয়ে ওঠে। এই সহজযানী দর্শন একান্তই ভাববাদী। সিদ্ধাচার্যগণ সহজমার্গের পথিক ছিলেন। শুষ্ক তত্ত্বকথা নিয়ে তাঁরা সন্তুষ্ট থাকতেন না। সেজন্য প্রথাগত সংস্কারের ধারও তাঁরা ধরতেন না।

মায়াপ্রপঞ্চ ও দ্বৈতবোধের ঊর্ধ্বে স্থিত যে ‘বোধিচিত্ত’, সকল প্রকার দ্বৈতবোধ পরিহার করে সাধনযোগে অবধূতিকামার্গের পথে সেই ‘বোধিচিত্ত’কে ‘মহাসুখকমল’-এ স্থিত করাই সিদ্ধাচার্যদের সাধনার লক্ষ্য ছিল। এই ‘মহাসুখ’ সহজযান মতে একটি বিশেষ তত্ত্ব। সাধক ‘মহাসুখ’ লাভ করলে মায়াময় পৃথিবী সম্পর্কে জ্ঞানরহিত হন। এখানে হিন্দুদর্শনের সমাধিতত্ত্বের সঙ্গে ‘মহাসুখ’ দর্শনের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। চর্যাকারগণ গুরুবাদকে স্বীকার করেছেন। কুক্কুরীপাদের মতে, এক কোটি লোকের মধ্যে একজন চর্যার গূহ্যার্থ অনুধাবনে সক্ষম। সেক্ষেত্রে গুরুভিন্ন গতি নেই। বাস্তবিকই চর্যার কথা লৌকিক অর্থের বদলে সংকেতে আবৃত হওয়ায় তা সর্বসাধারণের বুদ্ধিতে ঠিক ধরে না। এই দ্বৈতার্থের কয়েকটি নিদর্শন হলো: নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস অর্থে 'চন্দ্র', চিত্ত অর্থে 'হরিণ', জ্ঞানমুদ্রা অর্থে 'হরিণী', মহাসুখকায় অর্থে 'নৌকা', শবরী অর্থে 'দেবী নৈরাত্মা' ইত্যাদি

সাহিত্যমূল্য

চর্যার বিষয় ধর্মকেন্দ্রিক ও তত্ত্ববহুল হলেও তার বাহ্যিক রূপটি লৌকিক ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এর ফলে চর্যাপদের সাহিত্যিক মূল্যটি অস্বীকার করা যায় না। চর্যার কোনও কোনও পদে তত্ত্ব তার কাব্যের রূপটিকে ছাপিয়ে গেছে। সেইসব পদের সাহিত্যমূল্য নগন্য। কিন্তু অনেক পদেই যেসকল রূপকের আড়ালে ধর্মকথা ব্যাখ্যা করা হয়েছে তার সজীবতা ও পার্থিব সুবাস তাকে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর কাব্যচিত্ররূপে তুলে ধরেছে। এইসব পদের

সাহিত্যমূল্য অপরিসীম।

এই চিত্রকল্পগুলিই চর্যার সাহিত্যমূল্য বহন করছে। গুণ্ডরীপাদের একটি পদ পার্থিব প্রেমের তীব্র আর্তিতে জীবন্ত:

“যোইণি তঁই বিণু খনহিঁ ন জীবমি।

তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি।”

(পদ ৪, অর্থাৎ- যোগিনী, তোমাকে ছাড়া মুহূর্তকালও বাঁচব না। তোমার মুখ চুম্বন করে কমলরস অর্থাৎ পদ্মমধু পান করব।)

শবরপাদের একটি পদে দেখা যায় নরনারীর প্রেমের এক অপূর্ব চিত্রণ-

উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।

মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী।।

উমত সবরো পাগল শবরো মা কর গুলী গুহাডা তোহৌরি।

ণিঅ ঘরনি ণামে সহজ সুন্দারী।।

ণাণা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলি ডালী।

একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণ কুণ্ডলবজ্রধারী।।

(পদ ২৮, অর্থাৎ- উঁচু পর্বতে শবরী বালিকা বাস করে। তার মাথায় ময়ূরপুচ্ছ, গলায় গুঞ্জামালিকা। নানা তরু মুকুলিত হলো। তাদের শাখা-প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত হলো। শবর-শবরীর প্রেমে পাগল হলো। কামনার রঙে তাদের হৃদয় রঙিন ও উদ্দাম। শয্যা পাতা হলো। শবর-শবরী প্রেমাবেশে রাত্রিযাপন করলো।)

আবার সমাজ ও মানুষের প্রতি অকৃত্রিম দরদও আধুনিক পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঢেণ্ঢণের পদে দেখা যায়– “টালত মোর ঘর নাহি পরবেষী। / হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী।” (পদ ৩৩, অর্থাৎ- টিলার উপর আমার ঘর, কোনও প্রতিবেশী নেই। হাঁড়িতেও ভাত নেই, তবু নিত্য অতিথি আসে।)

কোনও কোনও পদে নিছক দর্শনকথা অসামান্য চিত্ররূপের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। চাটিল লিখছেন– “ভবণই গহণগম্ভীরা বেগেঁ বাহী। দুআন্তে চিখিল মাঝেঁ ন ঠাহী।” (পদ ৫, অর্থাৎ- ভবনদী গহন ও গম্ভীর অর্থাৎ প্রবল বেগে প্রবহমান। তার দুইতীর কর্দমাক্ত ও পিচ্ছিল।)

আবার কখনও বা তত্ত্বের ব্যাখ্যায় যে প্রহেলিকার অবতারণা করা হয়েছে, সেগুলিও অসামান্য সাহিত্যগুণমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। যেমন: কুক্কুরীপাদ লিখেছেন– “দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই। / রুখের তেন্তুলি কুম্ভীরে খাঅ।।” (পদ ২, অর্থাৎ- মাদী কাছিম দোহন করে দুধ পাত্রে রাখা যাচ্ছে না। গাছের তেঁতুল কুমিরে খাচ্ছে।)

গীতিধর্মীতা

চর্যাপদ একাধিক চরণবিশিষ্ট, অন্ত্যমিলযুক্ত ও গীতিধর্মী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সংস্কৃত সাহিত্যের চিত্রধর্মী শ্লোক বাংলা সাহিত্যের উপর কোনও স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। বরং চর্যার গীতিকবিতাগুলিই পরবর্তী বাংলা কাব্যসঙ্গীতের আঙ্গিকের ক্ষেত্রে আদর্শ হয়ে ওঠে। অন্যদিকে চর্যার কবিরা যে তাঁদের ধর্মদর্শন ও সাধনপদ্ধতি রূপকের আড়ালে ব্যক্ত করে গান বেঁধেছিলেন, পরবর্তীকালের হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সাধককবিরা সেই আদর্শেই তাঁদের স্ব স্ব ধর্মীয় সাধনসঙ্গীত রচনায় প্রবৃত্ত হন। বৈষ্ণব পদাবলি, বাউল গান, সুফি মুর্শিদি গান, নাথপন্থী দেহযোগী গান বা শাক্তপদাবলি– সবই চর্যাসংগীতের উত্তরসূরী।

চর্যার পদগুলিতে পদকর্তাদের নামের সঙ্গে বিভিন্ন রাগ-রাগিনীর নামও পাওয়া যায়। এথেকে সহজেই অনুমিত হয় যে, এই পদগুলি সুরসহযোগে গাওয়া হতো। পটমঞ্জরী রাগে চর্যার ১১টি পদ (পদ- ১, ৬, ৭, ৯, ১১, ১৭, ২০, ২৯, ৩১, ৩৩ ও ৩৬) নিবদ্ধ। এই রাগে গাওয়া পদের সংখ্যাই সর্বাধিক। এরপরেই মল্লারী রাগে ৫টি পদ (পদ- ৩০, ৩৫, ৪৪, ৪৫ ও ৪৯) নিবদ্ধ রয়েছে। ৪টি করে পদ ভৈরবী (পদ-১২, ১৬, ১৯ ও ৩৮), কামোদ (পদ- ১৩, ২৭, ৩৭ ও ৪২), বরাড়ী (চর্যায় অপর নাম বলাড্ডি, পদ- ২১, ২৩, ২৮ ও ৩৪) এবং গুঞ্জরী (চর্যায় অপর নাম গুঁজরী বা কহূ গুংজরী, পদ- ৫, ২২, ৪১ ও ৪৭) রাগে

নিবদ্ধ। গৌড় (চর্যায় নাম গবড়া বা গউড়া, পদ- ২, ৩, ১৮) রাগে ৩টি পদ নিবদ্ধ। দেশাখ (চর্যায় অপর নাম দ্বেশাখ, পদ- ১০ ও ৩২), রামকেলি (চর্যায় অপর নাম রামক্রী, পদ- ১৫ ও ৫০), আশাবরী (চর্যায় অপর নাম শিবরী বা শবরী, পদ- ২৬ ও ৪৬) ও মালসী (চর্যায় অপর নাম মালসী গবুড়া, পদ- ৩৯ ও ৪০) রাগে ২টি করে এবং অরু (পদ ৪), দেবগিরি (চর্যায় অপর নাম দেবক্রী, পদ ৮), ধানশী (চর্যায় অপর নাম ধনসী,পদ ১৪) ও বঙ্গাল (পদ ৩৩) রাগে একটি করে পদ নিবদ্ধ। ২৫তম পদটি খণ্ডিত ও এর রাগনির্দেশ জানা যায় না।

চর্যাগীতিতে প্রতি পদের প্রত্যেক দুই লাইনের শেষে ধ্রু এই শব্দটি পাওয়া যায়, যা ধুঁয়া বা ধ্রুবপদের সংকেত বলে ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় মনে করেছেন। চর্যাপদের সংস্কৃত টীকাতে ধ্রুবপদেন দৃঢ়ীকুর্বন, ধ্রুবপদেন চতুর্থানন্দমুদ্দীপয়ন্নাহ ইত্যাদি ব্যাখ্যা থেকে এই প্রমাণ পাওয়া যায়। তিব্বতীতে এই পদকে ধু পদ বলা হয়েছে। প্রত্যেক পদ গাইবার পর শ্রোতাকে আকৃষ্ট করার জন্য বারবার ধ্রুবপদ গাইবার রীতি ছিল।

ছন্দ ও অলংকার

চর্যার পদগুলি প্রধানত পয়ার ও ত্রিপদী পদে রচিত। এতে মাত্রাছন্দের প্রভাবও দেখা যায়। ১৬ মাত্রার পাদাকুলক ছন্দের ব্যবহারই এখানে বেশি। তবে সর্বত্র নির্দিষ্ট মাত্রারীতি দেখা যায়নি। ছন্দপংক্তির পর্বসংখ্যাগত বৈচিত্র্যও এই পদগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, “তত্ত্বকথার ব্যাখ্যা এবং তাকে ব্রাহ্মণ সমাজের শ্যেনদৃষ্টি থেকে গোপন করা – এই দিকে পদকর্তারা এবং সিদ্ধাচার্যরা অত্যন্ত সচেতন ছিলেন বলে কবিতার আঙ্গিকের দিকে দৃষ্টি দেবার অবকাশ পাননি। তবে একটা কথা সত্য, চর্যাগানেই সর্বপ্রথম পয়ার-ত্রিপদীর আদিসুর ধ্বনিত হয়েছে। সংস্কৃতে রচিত গীতগোবিন্দও এর প্রভাব অস্বীকার করতে পারেনি।”

চর্যায় অনুপ্রাসের প্রয়োগ ব্যাপক। প্রায় প্রতিটি পদই অন্ত্যমিলযুক্ত। অন্তানুপ্রাসও প্রচুর। যেমন: “বাহ তু ডোম্বী বাহ লো ডোম্বী বাটত ভইলা উদারা”। চর্যায় উল্লিখিত ছন্দ ও অলংকারগুলি পরবর্তীকালের কবিদের পথপ্রদর্শকস্বরূপ হয়েছিল।

চর্যাপদ ও বাঙালি জীবন (সমাজ চিত্র)

চর্যাগীতিতে ব্যবহৃত উপমা ও রূপকল্পগুলি তৎকালীন বাংলার সমাজজীবন, পরিবারজীবন ও প্রাকৃতিক উপাদান থেকে সংগৃহীত। প্রসঙ্গত মনে রাখা প্রয়োজন, সেই যুগে বাংলার ভৌগোলিক সীমা আজকের পশ্চিমবঙ্গ-বাংলাদেশ ভূখণ্ডের বাইরেও পূর্বে অসম ও পশ্চিমে বিহার, ঝাড়খণ্ড ও পূর্ব উত্তর প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। চর্যাকারগণ সাধক হলেও কাঠখোট্টা তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন না। চারপাশের রূপরসময় পৃথিবীর সৌন্দর্য তাঁরা অকুণ্ঠ পান করে তাঁদের কাব্যকে সজীব ও প্রাণোচ্ছল করে তুলেছিলেন। এই কারণে তৎকালীন বাংলার ভূগোল ও সমাজ সম্পর্কে যে স্পষ্ট ছবি চর্যাপদ থেকে পাওয়া যায়, তা সেই সময়কার বাঙালির ইতিহাস রচনায় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

ভৌগোলিক উপাদান

চর্যায় নদী ও নৌকা-সংক্রান্ত রূপকের সংখ্যাধিক্য নদীমাতৃক বাংলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সাঁকো, কেডুয়াল, গুণ টানা, দাঁড় টানা, পাল তোলা, সেঁউতি, কাছি, খুণ্টী, উজান বাওয়া প্রভৃতি বারবার চর্যায় উল্লিখিত হয়েছে। ৩৮তম পদে দেখা যায়-

কাঅ ণাবডহি খান্টি মন কেডুয়াল।

সদগুরুবঅণে ধর পতবাল। ।

অর্থাৎ- কায় [হইল] ছোট নৌকাখানি, মন [হইল] কেরোয়াল। সদ্গুরু-বচনে পতবাল (পাল) ধর। (অনুবাদ: সুকুমার সেন)

এছাড়া পর্বত ও অরণ্যের উল্লেখও চর্যায় দেখা যায়।

বাঙলা সাহিত্যে শ্রেণীসংগ্রামের সূচনা হয়েছিল প্রথম চর্যাপদাবলীতেই। এ-কবিতাগুলোতে আছে অনেক সুন্দর সুন্দর উপমা; আছে মনোহর কথা, যা সত্যিকার কবি না হ'লে কেউ বলতে পারে না। একজন কবি একটি জিনিশ সম্বন্ধে বলেছেন, সে-জিনিশটি জলে যেমন চাঁদের প্রতিবিম্ব পড়ে, তার মতো সত্যও নয়, আবার মিথ্যেও নয়। এ-রকম চমৎকার কথা অনেক পরে বলেছেন রবীন্দ্রনাথ 'সাধারন মেয়ে' নামক একটি বিখ্যাত কবিতায়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "হীরে বসানো সোনার ফুল কি সত্য, তবু কি সত্য নয়?" সোনায় বানানো হীরেবসানো ফুল তো আর সত্যিকার ফুল নয়, ওটা হচ্ছে

বানানো মিছে ফুল। ও ফুল বাগানে ফোটে না, তবু আমরা তাকে ফুল বলি।

সামাজিক উপাদান

চর্যায় বাঙালি সমাজের, বিশেষত ব্রাহ্মণ্যপীড়িত অন্ত্যজ সমাজের এক দরদী চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। ডোম, শবর, চণ্ডাল প্রভৃতি অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের জীবন ও জীবিকার নানা তথ্য এই পদগুলি থেকে জানা যায়। আবার পারিবারিক জীবনের আচার ও ব্যভিচার উভয়ই সমান দক্ষতায় ফুটে উঠেছে চর্যার পদগুলিতে (২তম পদটি দ্রষ্টব্য)।

কাহ্নপাদের একটি পদে সেকালের বিবাহ-অনুষ্ঠানের চিত্র ধরা পড়েছে। সে যুগের খেলাধুলা, নৃত্যগীত ও আমোদপ্রমোদের চিত্রও চর্যাকারগণ সুপটু হাতে এঁকেছেন। বীণাপাদের ১৭তম পদটিতে আছে– “নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী। বুদ্ধ নাটক বিষমা হোই।।” (অর্থাৎ- বজ্রযান নাচছেন, দেবী গাইছেন আর বুদ্ধনাটক অভিনীত হচ্ছে।)

একটি কবিতায় এক দুঃখী কবি তাঁর সংসারের অভাবের ছবি এতো মর্মস্পর্শী ক'রে এঁকেছেন যে পড়তে পড়তে শিউরে উঠতে হয়। কবির ভাষা তুলে দিচ্ছি: "টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী। হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী।। বেঙ্গ সংসার বডহিল জাঅ। দুহিল দুধ কি বেন্টে ষামায়।।" (অর্থ: টিলার ওপরে আমার ঘর, আমার কোনো প্রতিবেশী নেই। হাঁড়িতে আমার ভাত নেই, আমি প্রতিদিন উপোস থাকি। বেঙের মতো প্রতিদিন আমার সংসার বেড়ে চলেছে, যে-দুধ দোহানো হয়েছে তা কি আবার ফিরে গাভীর বাঁটে।)

এছাড়াও সেযুগের ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ড, সাজসজ্জা, তৈজসপত্র, বাদ্যযন্ত্র, নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র, খাদ্যপানীয় সবই চর্যার গানগুলিতে টুকরো টুকরো ছবির আকারে ধরা পড়েছে।

চর্যাপদে নারীদের অবস্থান

চর্যাপদের যুগে নারীরা খুব স্বাধীন ছিলেন বলে জানা যায়। তারা স্বেচ্ছায় সঙ্গী ও পেশা নির্বাচনের অধিকার রাখতেন। কুক্কুরীপা গৃহবধূর ছল করা নিয়ে বলেছেন, "সে দিনের বেলায় কাকের ডাকে ভয় পায়, কিন্তু রাতে প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করতে যায়।" ডোম্বীপাদের ১৪ নম্বর পদে নারীদের নৌকা চালনা, লোক পারাপার, নৌকার জলসিঞ্চন ইত্যাদি কর্মে অংশগ্রহণের উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া সেসময় নারীরা গুরুর স্থানও অধিকার করেছিল।

প্রবাদ

চর্যাপদে প্রবাদ বাক্য ৬টি।এগুলো হলো:

প্রবাদ	পদে অবস্থান	কবির নাম	অর্থ
আপনা মাংসেঁ হরিণা বৈরী	৬ নং পদ	ভুসুকুপা	হরিণের মাংসই তার জন্য শত্রু
হাতের কাঙ্কন মা লোউ দাপন	৩২ নং পদ	সরহপা	হাতের কাঁকন দেখার জন্য দর্পণের প্রয়োজন হয় না
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী	৩৩ নং পদ	ঢেগুণ পা	হাড়িতেঁ ভাত নেই, অথচ প্রতিদিন প্রেমিকেরা এসে ভীড় করে
দুহিল দুধু কী বেন্টে সামায়	৩৩ নং পদ	ঢেগুণ পা	দোহন করা দুধ কি বাটে প্রবেশ করানো যায়?
বর সুন গোহালী কিমু দুঠ্য বলন্দেঁ	৩৯ নং পদ	সরহপা	দুষ্ট গরুর চেয়ে শুন্য গোয়াল ভালো
আন চাহন্তে আন বিনধা	৪৪ নং পদ	কঙ্কন পা	অন্য চাহিতে, অন্য বিনষ্ট

ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

প্রাচীন বাংলার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলির সন্ধানে প্রাকৃত বাংলায় রচিত চর্যাপদ একটি মূল্যবান উপাদান। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রথম এই বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করেন তাঁর The Origin and Development of the Bengali Language গ্রন্থে। এরপর ডক্টর সুকুমার সেন, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, তারাপদ মুখোপাধ্যায়, পরেশচন্দ্র মজুমদার ও ডক্টর রামেশ্বর শ' চর্যার ভাষাতত্ত্ব নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা করেন। ফলে আজ চর্যার ভাষার স্বরূপটি অনেক বেশি সুস্পষ্ট হয়ে গেছে।

ধ্বনিতত্ত্ব

- ★ চর্যায় অ-কার কিছু বেশি বিবৃত (open) ; কতকটা আধুনিক আ-এর কাছাকাছি। সম্ভবত আদিস্বরের শ্বাসাঘাতের জন্য অ/আ ধ্বনির বিপর্যয় দেখা যায়। যেমন: অইস/আইস, কবালী/কাবালী, সমাঅ/সামাঅ ইত্যাদি।
- ★ ব্যঞ্জনধ্বনির ক্ষেত্রে প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো: পদমধ্যে 'হ'-ধ্বনির সংরক্ষণ (যেমন: খনহ, তঁহি, করহ ইত্যাদি); মহাপ্রাণ বর্ণের অস্তিত্ব (যেমন: আন্ধে, কাহ্ন, দিঢ় ইত্যাদি) এবং ওড়িয়া-সুলভ 'ল' (l)-ধ্বনি বজায় থাকা।
- ★ প্রাকৃতের সমযুগ্মব্যঞ্জন সরলীকৃত হয়ে চর্যায় একক ব্যঞ্জনে পরিণত হয়েছে। ফলে পূর্বস্বরের পূরকদীর্ঘত্ব ঘটেছে। যেমন: প্রাচীন ভারতীয় আর্য 'মধ্য'> মধ্য ভারতীয় আর্য 'মজ্ঝ'> প্রাকৃত বাংলা 'মাঝ' ইত্যাদি।
- ★ নাসিক্যব্যঞ্জনের পূর্বস্বর দীর্ঘত্বলাভের সঙ্গে সঙ্গে অনুনাসিক হয়ে গেছে। যেমন: চন্দ্র>চন্দ>চাঁদ ইত্যাদি।
- ★ পাশাপাশি অবস্থিত একাধিক স্বরধ্বনির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। যেমন: উদাস>উআস। পদান্তেও স্বরধ্বনির ব্যবহার দেখা যায়। যেমন: ভণতি>ভণই ইত্যাদি।
- ★ পদান্তে স্থিত একাধিক স্বর যৌগিক স্বররূপে উচ্চারিত হতো এবং ক্রমে দুইয়ে মিলে একক স্বরে পরিণত হত। যেমন: প্রাচীন ভারতীয় আর্য 'পুস্তিকা'> মধ্য ভারতীয় আর্য 'পোত্থিআ'> প্রাকৃত বাংলা 'পোথী' ইত্যাদি।
- ★ 'য়'-শ্রুতি বিদ্যমান ছিল; 'ব'-শ্রুতিও দেখা গেছে। যেমন: নিয়ড্ডী>নিয়ড়ি; নাই>নাবী ইত্যাদি।
- ★ চর্যায় স্বরসংগতির দু-একটি উদাহরণ মেলে। যেমন: সসুরা (<শ্বশুর) ইত্যাদি।
- ★ 'শ', 'ষ', 'স' এবং 'ন', 'ণ'-এর যথেচ্ছ ব্যবহার দেখা যায়। যেমন: নিঅ/ণিঅ, নাবী/ণাবী, সহজে/ষহজে, আস(<আশা) ইত্যাদি।
- ★ দীর্ঘস্বর ও হ্রস স্বরের উচ্চারণের পার্থক্য হ্রাস পেয়েছিল। যেমন: শবরি/সবরী, জোই/জোঈ ইত্যাদি।
- ★ পদের আদিতে 'য'-ধ্বনি 'জ'-ধ্বনিতে পরিণত হয়েছিল। যেমন: জাই/যাই।

রূপতত্ত্ব

- ★ চর্যার নামপদের লিঙ্গভেদ ছাড়াও সর্বনাম, বিশেষণ, সম্বন্ধবাচক শব্দেও লিঙ্গভেদ ছিল। যেমন: হরিণ/হরিণী, শবরা/শবরী, 'রাতি পোহাইলি', 'গুঞ্জরী মালী' ইত্যাদি।
- ★ একবচন-বহুবচনের পার্থক্য ছিল; সংখ্যাবাচক শব্দযোগে, সমষ্টিবাচক পদযোগে এবং দ্বিরুক্তিপদ প্রয়োগের দ্বারা বহুবচন বোঝান হতো। যেমন: 'বতিস জোইনী', 'পঞ্চবিডাল', 'উঁচা উঁচা পাবত' ইত্যাদি।
- ★ চর্যায় কারক মুখ্যত দুটি। যথা: মুখ্যকারক ও গৌণকারক। মুখ্যকারকে বিভক্তি শূণ্য বা -এ। যেমন: 'সরহ ভণই', 'কুম্ভীরে খাঅ' ইত্যাদি। গৌণকারকে -এঁ বা -এ বিভক্তি। যেমন: 'সহজে থির করি' (কর্ম কারক), 'কুঠারে ছিজঅ' (করণ কারক), 'হিএঁ মাঝে' (অধিকরণ কারক) ইত্যাদি। বিভক্তিহীনতার উদাহরণও পাওয়া যায়। যেমন: 'কায়া তরুবর'।
- ★ -এর ও -ক বিভক্তির মাধ্যমে সম্বন্ধপদ নিষ্পন্ন হতো। যেমন: 'রুখের তেন্তুলি', 'করণক পাটের আস' ইত্যাদি।
- ★ -ক, -কে ও –রে বিভক্তি দ্বারা গৌণকর্মের ও সম্প্রদানের পদসিদ্ধ হতো। যেমন: 'নাশক', 'বাহবকে পারই', 'রসানেরে কংখা' ইত্যাদি।
- ★ -ই, -এ, -হি, -তেঁ ও –ত অধিকরণের বিভক্তি হিসাবে ব্যবহৃত হতো। যেমন: 'নিঅড়ি', 'ঘরে', 'হিঅহি', 'সুখদুখেতেঁ',

‘হাঁড়িত’ ইত্যাদি।

- ★ করণের বিশিষ্ট বিভক্তি –এঁ সপ্তমীর সঙ্গে প্রায় অভিন্ন হওয়ার কারণেও –তেঁ, -এতেঁ, -তে বিভক্তি দেখা যায়। যেমন: ‘সাঁদে’ (<শব্দেন), ‘বোধেঁ’ (<বোধেন), ‘মতিএঁ’, ‘সুখদুখেতেঁ’ (<সুখদুঃখ+এ+ত+এন)।
- ★ অপাদানে অপভ্রষ্ট থেকে আগত -হুঁ বিভক্তি দু-একটি পাওয়া গেছে। যেমন: ‘খেপহুঁ’, ‘রঅনহুঁ’।
- ★ চর্যাপদে গৌণকারকে ব্যবহৃত অনুসর্গেও (post position) বৈচিত্র্য দেখা যায়। যেমন: ‘ডোম্বী-এর সঙ্গে’ (নামবাচক অনুসর্গ), ‘দিআঁ চঞ্চালী’ (অসমাপিকা অনুসর্গ)।
- ★ সংস্কৃতের মতো কর্মভাববাচ্যের প্রচুর উদাহরণ চর্যাপদে আছে। যেমন: ‘নাব ন ভেলা দীসই’, ‘ধরণ ন জাই’ ইত্যাদি।
- ★ চর্যাপদে যৌগিক কালের উদাহরণ না থাকলেও যৌগিক ক্রিয়ার উদাহরণ প্রচুর আছে। যেমন: ‘গুণিআ লেহুঁ’, ‘নিদ গেল’ ইত্যাদি।
- ★ নিষ্ঠাপ্রত্যয়ে –এ বিভক্তি দেখা যায়। যেমন: ‘সহজে থির করি’ ইত্যাদি।
- ★ চর্যায় এমন সব বিশিষ্ট প্রয়োগ আছে যা বাংলা ভাষাভিন্ন অন্য ভাষায় পাওয়া যায় না। যেমন: ‘ভান্তি ন বাসসি’, ‘দুহিল দুধু’ ইত্যাদি।
- ★ কর্মভাববাচ্যে অতীতকালে –ই, -ইল এবং ভবিষ্যতকালে –ইব বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন: ‘চলিল কাহ্ন’, ‘মই ভাইব’ ইত্যাদি।
- ★ প্রাচীন বাংলার চর্যাপদে ব্যবহৃত প্রবচনগুলি বাংলা ভাষায় ঐতিহ্যবাহী। যেমন: ‘হাড়িত ভাত নাহি নিতি আবেশী’, ‘আপনা মাংসেঁ হরিণা বৈরী’ ইত্যাদি।

তথ্যসূত্র : উইকিপিডিয়া এবং ইন্টারনেট